সূচি পত্র

বন্দি	০৯
জমি	২৪
সাক্ষী	৪৩
শয়তান	৬৩
ক্ষুধা	৭২
জানালা	৯০
ইভিল	১১১
উধাও	১৩০
ইউরোপা	১৩৮
রাত	১৫৬

বন্দি

তখনকার জার্মানি এক আলাদা ব্যাপার ছিল, বুঝলেন! ঘন জঙ্গল, দুর্গম পাহাড়, মাঝে-মাঝে সবুজ উপত্যকা আর তার বুক চিরে ছুটে যাওয়া তেজিয়ান নদী— সব মিলিয়ে সে দেশের সঙ্গে আর কারও তুলনাই হয় না। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল।

বস্টনের ইলিংটন পরিবার নামি ও দামি বলে খ্যাত। সেই নাম-দামের উত্তরাধিকারী হিসেবে আমি অনেকের ঈর্ষার পাত্র ছিলাম। কিন্তু দিনরাত নিয়ম আর প্রত্যাশার চাপ নিতে-নিতে আমি পাগল হতে বসেছিলাম। থাকতে না পেরে একদিন বাবাকে বোঝালাম, মেসার্স ইলিংটন, ক্যারুথার্স অ্যান্ড ব্লেক-এর একজন হয়ে বসার আগে আমার বছরখানেক বিদেশে কাটানো দরকার। তাতে আমার বুদ্ধিগুলো 'পাকবে'। কী যে পাকবে, তা বুঝতে পিতৃদেব বিশেষ সময় নেননি। তবে অনুমতি পাওয়া গেছিল।

প্যারিতে আসার পর প্রথম কিছুদিন ভালোই কেটেছিল। কিন্তু তারপরেই একঘেয়েমি ধরে গেল। ল্যুভরের গ্যালারি থেকে রাতের হুর-পরির দল— কিছুই ভালো লাগছিল না। একরকম ঝোঁকের মাথায় ঠিক করে ফেলেছিলাম, সাইকেলে চেপে ইউরোপ ঘুরতে বেরোব। তাতে যদি কিছু অ্যাডভেঞ্চার জোটে কপালে!

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। ঝটপট ব্যবস্থা করে বেরিয়ে পড়লাম। সুখী শরীর প্রথমে কাহিল হল। কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই একটা নতুন নিয়মে

অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। সারাদিন প্যাডেলে চাপ দিয়ে মাইলের পর মাইল পথ পেরোতাম। সন্ধে নামলে এমন কোনো একটা সরাইখানা বা হোটেল খুঁজে নিতাম, যার মালিক মোটামুটি ইংরেজি বোঝে। খাওয়া, হইহল্লা, আর তারপর নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব ঘুম।

সব মিলিয়ে, সত্যিই ভালো লাগছিল তখন।

ফ্রান্স আর বেলজিয়াম পেরিয়ে এলাম। জার্মানিতেও জঙ্গল, পাহাড়, ঘাসজমি এসবের মধ্য দিয়ে আমি দিব্যি এগোচ্ছিলাম। ঝামেলা হল মোজেল ভ্যালি পৌঁছেই। সাইকেল চালাতে গিয়ে টের পাচ্ছিলাম, শরীরের ভেতরে একটা অন্যরকম তাপ ক্রমশ বেড়ে উঠছে। মাথাব্যথা আর ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা নিয়েও আরও মাইল দুয়েক চললাম। তারপর থামতে বাধ্য হলাম। নিউমোনিয়া-র চিহ্নগুলো আমার অচেনা নয়। শরীর জুড়ে কাঁপুনি, দুর্বলতা, হঠাৎ-হঠাৎ গরম আর ঠান্ডা লাগা, চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসা— আমি এগুলো বিলক্ষণ চিনি।

গাছের ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম। অতি কষ্টে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা গ্রাম চোখে পড়ল। ওই অবস্থাতেও আমার বিদ্যেবোঝাই মগজ সেখানকার বাড়িগুলোর গড়ন, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, বাড়ির সামনে নীচু জায়গায় প্রায় লুকিয়ে থাকা দোকানপাট এসব দেখে বুঝে গেল, গ্রামটা খুউব পুরোনো। রাস্তায় ঠোক্কর খেতে-খেতে আমি গ্রামটায় ঢুকলাম। পথে যারা ছিল তারা কৌতূহলী হয়ে আমায় দেখল। তারপর... অন্ধকার!

চেতনা ফিরে আসার পর সবচেয়ে আগে পেচ্ছাপ আর খড়ের গন্ধ পেলাম। তারপর বুঝতে পারলাম, জ্বর না থাকলেও আমি এতটাই দুর্বল যে হাত-পা নাড়ানো অসম্ভব। মাথার ভেতরটা দপদপ করছে। আর পেটের ভেতরটা একদম খালি।

ধীরে, খুব সাবধানে চোখ খুলে দেখলাম, আমি একটা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি। ঘরটা ছোট্ট। রুক্ষ পাথুরে দেওয়াল, মাটির মেঝে, একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি ন্যাড়া জানলা— ব্যস। বিছানার বদলে আমি একটা খড়ের গাদায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলাম। পাশে একটা কাঁচা হাতে বানানো টেবিল। টেবিলে একটা জলের কুঁজো আর একটা কামানো মাথা।

শুকনো গলা দিয়েও বোধহয় আর্তনাদ গোছের কিছু বেরিয়েছিল। তাতে মাথাটা টেবিল ছেড়ে ওঠায় মাথার মালিককে দেখতে পেলাম। একান্তই ছোটোখাটো মানুষটি তাঁর তুলনায় অনেক বড়ো মাপের একটা আলখাল্লার মধ্যে প্রায় লুকিয়ে থেকে ঘুমোচ্ছিলেন বলে তাঁকে ঠিক ঠাহর

রাত

তখন রাত্তির সোয়া দশটা। হার্ব টুকল্যান্ডার ওরফে টুকি সবে 'টুকি'জ বার' বন্ধ করার তোড়জোড় করছিল। শৌখিন ওভারকোট পরা লোকটা ঠিক তখনই দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

তারিখটা আমার এখনও মনে আছে— দশই জানুয়ারি। বাইরে যা একখানা তুষারঝড় বইছিল তেমনটা আমরা, মানে এখানকার পোড়খাওয়া লোকজনও বিশেষ দেখিনি। সূর্য ডোবার আগেই ইঞ্চিছয়েক পুরু বরফ জমেছিল। তারপর ব্যাপারটা আরও বেড়েছিল। বিলি ল্যারিবি শহরের তরফে রাস্তার বরফ সরায়। ও এখান দিয়ে দ্বিতীয়বার বরফ সরানোর সময় টুকি ওকে বিয়ার খাইয়েছিল। বিলিই বলেছিল, বড়ো রাস্তাটা সাফ রাখতে পারলেও সরু, ছোটো রাস্তাগুলো এর মধ্যেই বরফের তলায় একেবারে চাপা পড়ে গেছে। পোর্টল্যান্ড রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছিল, ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে তুষারঝড় বয়ে যাবে এখান দিয়ে। তাই আমরা কেউ যেন ঘরের বাইরে না বেরোই।

"এবার বন্ধ করব, বুথ।" চিমনিতে হাওয়ার শব্দ শুনে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়েছিল টুকি, "বেরোবার আগে এক পাত্তর চড়িয়ে নাও— ব্যস।"

গ্লাসে পানীয় ঢালা হয়েছে কি হয়নি, লোকটা ঢুকল। ওর গোটা শরীরে যেভাবে বরফ লেগেছিল তাতে মনে হচ্ছিল, ও চিনির গুদামে গড়াগড়ি খেয়ে এসেছে। ওর পিছু নিয়ে ঢুকে বারের ভেতরেও মিহি বালির মতো একরাশ বরফ উড়িয়ে দিল হাওয়া।

"দরজাটা বন্ধ করুন!" টুকি চেঁচাল, "বুদ্ধিসুদ্ধি নেই নাকি মশাই? এত রাতে বাইরে কী করছেন?"

"আমার মেয়ে..." লোকটার চোখ উলটে গেল। অজ্ঞান হওয়ার আগে ও শুধু বলল, "আমার বউ...!"

ধপাস্! টুকি মাথা নেড়ে আমাকে বলল, "দরজাটা তুমিই বন্ধ করে দাও বুথ।"

হাওয়ার সঙ্গে কুস্তি লড়ে দরজাটা বন্ধ করতে বেগ পেতে হল। টুকি ইতিমধ্যে আমাদের মক্কেলটির মুখ তুলে দেখছিল। আমার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। ওর দৃষ্টি আমিও পড়তে পারলাম। লোকটার মুখটা লাল টুকটুকে হয়ে থাকলেও তাতে এখানে-সেখানে ধূসর ছোপ লেগেছিল। ওগুলোর মানে আমি জানি— ফ্রস্টবাইট।

"ব্র্যান্ডিটা নামাও।" লোকটার মাথাটা যথাসাধ্য সোজা করে ধরল টুক, "তারপর স্রেফ এক ছিপি ঢালো।"

লোকটা ইতিমধ্যে চোখ খুলেছিল। কিছু একটা বিড়বিড়ও করছিল, তবে এত নিচু স্বরে যে আমি কিছু শুনতে পাইনি। আমি টুকিকেই জিজ্ঞেস করলাম, "এক ছিপিতে কিছু হবে?"

"ওটা একেবারে আগুন জিনিস। এক ছিপিই যথেষ্ট।"

টুকি'র কথামতো আমি ওই একছিপি ব্র্যান্ডি লোকটার মুখ খুলিয়ে ঢেলে দিলাম। একেবারে ম্যাজিকের মতো ফল হল। লোকটা প্রথমে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল, তারপর কাশতে শুরু করল। ওর মুখটা আরও লাল হয়ে গেল। চোখগুলো একেবারে ড্যাবড্যাব করে খুলে গেল। লোকটার কাশিটা বিষমের চেহারা নিচ্ছিল বলে টুকি ওর পিঠে থাবড়া মেরে ওকে থামাল।

"ঠিক আছে।" নরম গলায় বলল টুকি, "এবার শ্বাস নিন। ধীরে-ধীরে।"

লোকটা সামলে নিচ্ছিল। আমি ওর আপাদমস্তক দেখে বুঝলাম, এ পাক্কা শহুরে পাবলিক। ওর কোট, জুতো থেকে শুরু করে হাতের পাতলা ফিনফিনে দস্তানা— সবই দামি, কিন্তু বাইরে যা চলছে তার সামনে একেবারে বেকার। নির্ঘাত আরও বেশ ক'জায়গায় ফ্রস্টবাইট হয়েছে ওর।